সংবাদ

তারিখ 2 3 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

আদিবাসীদের প্রাথমিক শিক্ষা বঞ্চনার নানা দিক

কুমার প্রীতীশ বল

প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন ১৯৯০-এর আওতায় প্রতি বছর ১৭ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিশু জরিপ করে থাকেন। এই জরিপের ভিত্তিতে পরের বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু অজানা কারণে আদিবাসী শিশুরা এই জরিপের আওতায় আসে না কিংবা বাদ পড়ে যায়। অথচ বিশ্বের ত্রিশ কোটি আদিবাসীর মধ্যে বাংলাদেশে বিশ লক্ষাধিক আদিবাসীর বসবাস। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালি জাতিসত্তার প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে দিনে দিনে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা লুপ্ত হচ্ছে। আদিবাসী হিসেবে, সর্বোপরি বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ন্যায্য অধিকার থেকেও নানাভাবে তারা বঞ্চিত। তাদের নানা বঞ্চনার মধ্যে অন্যতম হলো সর্বজনীন শিক্ষার সুযোগের অভাব। অনেক আদিবাসী জাতিসত্তা আছে যাদের মধ্যে একজনও সাক্ষর লোক নাই। বঞ্চিত আদিবাসীদের বঞ্চনার কয়েকটি বিবরণ উল্লেখ করলে পাঠক একটি সামগ্রিক চিত্র পেতে পারেন।

বঞ্চনা : পার্বত্য চট্টগ্রাম

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ১৯৮০ সালে মুরং জাতিসত্তার লোকদের জন্য বান্দরবান সদরে ইউনিসেফের অর্থায়নে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে এই স্কুলের জন্য ইউনিসেফের বরাদ্দকৃত টাকা শেষ পর্যন্ত যথাসময়ে ছাড় করানো যায়নি। একদশক আগের এক জরিপ থেকে জানা যায়, ৯৬ হাজার জনমানুষ অধ্যুষিত তিনটি পার্বত্য জেলায় ৯টি কলেজ, ৭৮টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ১১৭৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু পরের একদশকে এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়েনি, বরং কমেছে। এখানকার অধিকাংশ স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা একের অধিক নয়। পার্বত্য জেলা তিনটিতে সরকারি স্কুল-কলেজের দৈন্যদশা বর্ণনাতীত। এখানে শিক্ষকদের বদলি করা হয় শাস্তিস্বরূপ। এখানে বদলি হয়ে আসা সমতলভূমির শিক্ষকরা তাই মনে করেন। এমতাবস্থায় তাদের কাছ থেকে উন্নততর শিক্ষা কী করে প্রত্যাশা করা যায়?

পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরক্ষর মানুষ অধ্যুষিত বান্দরবান জেলার একটি উপজেলার নাম থানচি। এখানে কোন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখানে আছে ১টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫২টি এনজিও-পরিচালিত স্কুল এবং ১টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা। তারপরও এই উপজেলা আদিবাসী লোকরা নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। আর এই নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে অবাধে বিচরণ করছে মাদক ব্যবসায়ীরা। এখানে আদিবাসীদের কাছে গত শতকের সাত এবং আটের দশকে মাদক ধ্বংসনাশক হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। ফলে ধীরে ধীরে তারা লেখাপড়া ভুলে মাদকাসক্ত হতে থাকে।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাটি প্রতিবেশী দেশ ভারতের মিজোরামের কাছেই। এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ উপজেলা (৭০৩ বর্গ কি.মি.) হিসেবে পরিচিত। এখানে ৪৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৭টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি এবতেদায়ি মাদ্রাসা, ১৭টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১টি দাখিল মাদ্রাসা এবং একটি কলেজ আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কলেজ পর্যন্ত সর্বত্র হতাশাজনক পরিস্থিতি বিরাজমান। বলা হচ্ছে, এখানে সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। কারণ, এখানে কোন মনিটরিং ব্যবস্থা নেই। উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী শিক্ষা অফিসারের ৩টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে আছে। এছাড়া অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং কমিটি অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ করে থাকে। শিক্ষকরা শিক্ষকতার পরিবর্তে অন্য কাজেই ব্যস্ত থাকেন বেশি। এসব নানাবিধ কারণে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা অচল হয়ে পড়েছে। আদিবাসী অভিভাবকদের অসচেতনতাও এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ার অন্যতম কারণ। রাঙ্গামাটির ভোকেশনাল টেক্সটাইল ট্রেনিং স্কুলের বিরুদ্ধেও আছে নানান অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ। সহজ-সরল পার্বত্য আদিবাসীরা এখানে নানাভাবে বারবার প্রতারিত ও বঞ্চিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা নামের সর্বজনীন সুযোগটি সরকারিভাবে কী রকম অবহেলিত-তা আর একবার উপলব্ধিতে আনার জন্য রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ির আরও একটি তথ্য উল্লেখ করছি। বাঘাইছড়ি উপজেলার আবাসিক বিদ্যালয়টি শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অর্থায়নে জেলা পরিষদের আওতায় ১৯৯৫-১৯৯৬ সালে নির্মাণ করা হয়। বিদ্যালয়টি নির্মাণের জন্য ১ কোটি ৩৩ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু এতে ব্যয় হয়েছে ৮৫ লাখ টাকা। দূরবর্তী শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ের পাশাপাশি থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয়টি চালু করার জন্য কোন শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ করা হয়নি। ফলে দীর্ঘ নয় বছরেও বিদ্যালয়টি চালু করা সম্ভব হয়নি। অবকাঠামোগত নানান অব্যবস্থা আদিবাসীদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে শুধু ব্যাহতই করেনি, তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে আগমনের পথকেও অনেকাংশে অবরুদ্ধ করে দিয়েছে।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় পৌরসভার ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৩ হাজার শিক্ষার্থী উপবৃত্তির টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকেরা এই বঞ্চনাকে শিক্ষাচর্চার ক্ষেত্রে নির্মম আঘাত হিসেবে বিবেচনা করতেই পারে। এই জেলার রামগড় চা বাগানের কাছাকাছি কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় চা বাগানের শিশুরা দীর্ঘদিন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এখানকার আদিবাসী গ্রামের শিক্ষাবঞ্চিত ৯০ ভাগ শিশুর দিন কাটে কখনও জঙ্গলি আলু বা শাকসবজির খোঁজে। কখনও বা নদী-নালা কিংবা ছড়ায় কাঁকড়া, শামুক ও মাছের সন্ধানে। এছাড়াও গরু-মহিষ চরানোসহ নানান ঝুঁকিপূর্ণ কাজে এসব শিক্ষাবঞ্চিত আদিবাসী শিশু নিয়োজিত থাকে। খাগড়াছড়ি জেলায় শিক্ষাবঞ্চিত আদিবাসী শিশুর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আবার এসব শিশুর বেশির ভাগই পুষ্টিহীনতার শিকার। যে বয়সে আদিবাসী শিশুদের বই-খাতা নিয়ে স্কুলে যাওয়ার কথা, সেই বয়সে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ার জন্য বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় তাদের শ্রম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে।

বঞ্চনা : সিলেট

সিলেট বিভাগের আদিবাসীদের মধ্যে খাসিয়া ছাড়াও চা শ্রমিক আদিবাসীরা সংখ্যায় বেশি। চা শ্রমিক আদিবাসীরা হলো দেশওয়ালী, উড়িয়া, তেলেগু, বাংলা ইত্যাদি। ব্রিটিশ শাসনামলে চা শিল্পের বিকাশের সময়ে কৌশলে ইংরেজ রাজশক্তি চা শ্রমিক আদিবাসীদের জন্য শিক্ষার প্রসারে নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করে। এসব কারণে এদের মধ্যে আজ পর্যন্তও শিক্ষার প্রসার ঘটেনি। বাংলাদেশের ১৫৮টি চা বাগানের মধ্যে ১৫৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৪৬ জন শিক্ষক আছেন। চা শিল্প শ্রম আইন অনুযায়ী ৪০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন করে শিক্ষক থাকার কথা হলেও ৭০/৮০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক আছেন। এরপরও দেখা যায়, প্রায় ৯৫ ভাগ শিক্ষকের শিক্ষকতা করার মতো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই। এছাড়া এসব স্কুলে লেখাপড়ার কোন পরিবেশ নেই বললেই চলে। শিক্ষকরা পাঠ দান না করেই বেতন গ্রহণ করেন এবং বাগান কর্তৃপক্ষ এতে উৎসাহ প্রদান করে। 'চিলড্রেন দফা' বাগান মালিকদের সেই লক্ষ্যেই সৃষ্টি। চা শিল্পে সংশ্লিষ্ট আদিবাসী অভিভাবকরা মালিকদের প্রণীত সেই ফাঁদে পা দেয়। শ্রমিকরা অর্থপ্রাপ্তির লোভে শিশুদের শিক্ষালয়ে না পাঠিয়ে সেকশনে কাজ করাকে প্রয়োজন মনে করে। চা বাগানগুলো মদ বিক্রিতে অনুমতির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে অনুমতির প্রয়োজন হয়।

জেনারেল এরশাদ ১৯৮৭ সালে এক কোটি টাকা অনুদান প্রদান করে চা শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি শিক্ষা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেন। শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে এই ট্রাস্টের জন্য আরও এক কোটি টাকা প্রদান করেন। ট্রাস্টে প্রদত্ত টাকার লভ্যাংশ থেকে বিদ্যালয় মেরামত, আসবাবপত্র ক্রয় এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণে ব্যয়ের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু চা প্লান্টেশন লেবার রুলস অনুসারে চা বাগানের বিদ্যালয়ের এসব ব্যয় নির্বাহ করার কথা চা বাগান কর্তৃপক্ষের। আবার ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে একই পরিবারের একাধিক জনকে ট্রাস্টি করা হয়। এসব নিয়ম-নীতি থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এর মাধ্যমে আদিবাসী শিক্ষার্থীরা তেমন উপকৃত হবে না। চা শ্রমিক ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মানোন্নয়নে চা বোর্ড ইউরোপীয়ান ইকনোমিক কাউন্সিলের কাছ থেকে ১৯৯৮ সালে ৫ কোটি ৫৬ লাখ টাকা গ্রহণ করে। কিন্তু এই টাকা চা শ্রমিক শিক্ষার্থীদের কল্যাণে ব্যয় না করে শ্রীমঙ্গল পৌরসভার বিটিআরআই উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, দি বাডস রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ এবং চট্টগ্রামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণকাজে ব্যয় করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এখানে কোন চা শ্রমিকের সন্তান লেখাপড়া করে না। এভাবেই চা শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে।

(বাকি অংশ পরবর্তীতে)